বিবাহোত্তর

বলরাম বসাক

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

রিকসা স্ট্যানডে এসে, ‘কোন হোটেলে উঠবে?’ নীপা জিজ্ঞেস করল। শুভম বিশাল ব্যাগ খানা কাঁধ থেকে নামিয়ে সামনের একটা রিকসায় রাখল, বলল, ’হোটেলে কেন উঠব, রাজুদার ফ্ল্যাট থাকতে?’

‘এখানেও রাজুদার ফ্ল্যাট?’ ... তোমার রাজুদা ক’খানা ফ্ল্যাট করেছে গো?’

‘প্রোমোটার মানুষ, স্কোপ প্রচুর, কতো জায়গায় যে ফ্ল্যাটবাড়ি বানিয়ে রেখেছে, প্রত্যেকটা বিল্ডিংয়ে একটা করে ফ্ল্যাট নিজের জন্যে রেখে দিয়েছে ...’

‘কী লাভ এতো ফ্ল্যাট রেখে?’

‘লাভ? অনেক দুনম্বরি টাকা ব্যাঙ্কে রাখতে হল না। অ্যাসেট হয়ে থাকল, ভ্যালুয়েশন বাড়ছে...’

‘বেনামে?’

‘অফ্‌কোর্স।’

রিকসায় উঠে বসে চারদিক দেখতে দেখতে চলল। রাস্তাটা অল্প অল্প ওপরের দিকে উঠে, হঠাৎ যেন ধপাস করে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। চারদিকে পাকা বাড়ি খুবই কম, অধিকাংশই কাঁচামাটির চালাঘর, টালির চালা, টিনের চালা, বাঁশের খুঁটি। মাঝে মাঝে সবজি খেত। মাঝে মধ্যে পুকুর, সবুজ পানায় ঢাকা, কত রকম পাখি, অন্যদিকে রেললাইন। লোকাল ট্রেনটা দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

তিনমাস হল বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর দ্বিতীয়বার বেড়াতে আসা। প্রথমবার মাস দুই আগে --- গায়ে তখন বিয়ে-বিয়ে গন্ধ, সিঁথিতে সিঁদুর তখন খুবই উজ্জ্বল আর লম্বা করে টানা, ঝকঝক করছিল শাড়ি গয়না, শুভমের গায়েও তখন বিয়েতে পাওয়া নতুন শার্ট প্যান্ট জুতো, বেড়াতে যাওয়া এবং বিজনেস করতে যাওয়া দুটোই একসঙ্গে ঘটেছিল হলদিয়ায়। তাই বেড়ানোটা একদম জমেনি। হলদিয়ায় কোনও এক প্রাইভেট কনসার্নের ওয়ার্কশপে একটা ছোট খাটো কনস্ট্রাকশনের অন্তগত গ্যাসপাইপ - নেটওয়ার্কের সাবকনট্রাকটের কাজ নিয়ে শুভম হলদিয়ায় গিয়েচিল নীপাকে সঙ্গে নিয়ে। উদ্দেশ্য, বিয়ের ঠিক পরে বউকে নিয়ে বেড়ানোটাও সারা হবে, আর রোজগারও হবে। রথ দেখাও হবে, কলা বেচাও হবে। কিন্তু সে বার কলা বেচাই হয়েছিল? রথ দেখা হয়নি। নতুন বউকে তিনদিন ধরে ঘরে আটকে থাকতে হয়েছে। সেটাও ছিল শুভমের সেই রাজুদারই ফ্ল্যাট হলদিয়ায়। গ্যাসপাইপের নেটওয়ার্কের কাজে ষাটটি ঘন্টা ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল শুভমকে। কাজ শেষ করে এত ক্লান্তি যে সে বেচারি বউকে নিয়ে হলদি নদীর ধারে আধ ঘন্টাও কাটাতে পারেনি।

‘এবারেও কলা বেচবে না কি?’ নীপার ঠোঁটে মিষ্টি বাঁকা হাসি।

‘মাথা খারাপ, এবারে সেরকম কাজ নিয়ে আসিনি ...’

‘সেরকম কাজ নিয়ে আসোনি’, চমকে ওঠে চোখ দুটো নীপার, থমকে যায় কথা। তারপর ভ্রু কঁচকে ওঠে, ‘তার মানে কীরকম কাজ নিয়ে এসেছ?’

‘সামান্য, চার ঘন্টার মামলা, কাজটা রাজুদার। রাজুদার হয়ে আমাকে করতে হবে। রাজুদার রিকোয়েস্ট ঠেলতে পারা য

ায় না। তাছাড়া এমনি করাচ্ছে না। রাজুদা আমাকে কমিশন দেবে ফাইভ পারসেন্ট।'

'আমি এক্ষুনি বাড়ি ফিরে যাব।' খেপে উঠল নীপা, 'তুমি আমাকে ফের গোপন করেছ। বেড়ানোর সঙ্গে কাজও নিয়েছ -- সে কথা আমাকে খুলে বলার প্রয়োজন মনে করোনি? আবার আমাকে সেবারের মতো...'

'না, না, নীপা -- এবারে সেরকম হবে না', শুভম রিকসার মধ্যেই নীপাকে জাপটে ধরে, 'এবারে তো চার দিনের প্রোগ্রাম। প্রথমদিনটা শুধু কাজ, তোমাকে কথা দিচ্ছি প্রথম দিনটাই শুধু কাজ করব, হলে হবে না হলে না হবে। পরের তিনটি দিন শ্রেফ ট্যুর, একদিন চন্দননগর, একদিন ব্যানডেল, একদিন ত্রিবেণী' ---

বলে যাচ্ছে বটে শুভম, কিন্তু বিবাহোত্তর তিন মাসের যা অহিবজ্ঞতা নীপার, তাতে শুভমের কথার ওয়েটটা এখনো ঠিকঠাক নির্ণয়যোগ্য হয়ে ওঠেনি। নীপা শুধু ওর মুখের দিকে, ওর চোখের দিকে, ওর চোখের নাড়াচাড়া দিকে তাকিয়ে থাকে। ঐ চাহনির মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতার ছাপটা কেমন? শুভমও তাকায় নীপার চোখে। ঐ চোখের মধ্যে শুভম একটা মাদকতার ভাষা বুঝতে চেষ্টা করে।

রিকসা আর বেশি দূর গেল না। বাজার ছাড়িয়ে আসতেই চওড়া খুব সুন্দর বাঁধানো একটা রাস্তা। রাস্তায় অনেক লোকজন। এপারে ওপারে মাঝে মাঝে দোকান, মাঝে মাঝে মাঠ, কখনও ঝুপড়ির দোকান পাশে জলা মশার বসতি, কোথাও প্লট করা জমি, এদিকওদিক পাকা বাড়ি, কোনটা একতলা, কোনটা দোতলা। এরপরেই চোখে পড়ল জঙ্গল সাফকরা জমির উপর ফ্ল্যাট বাড়ির দঙ্গল। সেগুলোর আগে রাস্তার ওপর একটা সুরম্য তিনতলা বাড়ি। বিচিত্র ফুলের বাগান দিয়ে ঘেরা। এই বাড়িটা একটা হোটেল। হোটেলের পাশে দুটো ফ্ল্যাটবাড়ির পরেরটা রাজুদাদের ফ্ল্যাটবাড়ি। রাজুদার ফ্ল্যাট তিনতলায়।

শুভম চাবি বের করে দরজা খুলল। নতুন রঙের গন্ধ। ভেতরটা নির্জন। কথা বললে যেন মনে হয় কথাগুলো ঘর দুটোতে ভাসছে। ঢুকতেই যে ঘরটা সেখানে রয়েছে তিনটে লাল টুকটুকে প্লাস্টিকের চেয়ার। একটা হলদেটে খাটো সেনটার টেবিল। এই বসবার ঘরটা খুব ছোট্ট। ঘরের পুবদিকে একফালি ডাইনিং স্পেস। সবটাই ঢেকে গেছে একটা ছোট্টো ডাইনিং পাতা, অন্যপাশে কাঠের আলমারি, দেয়ালসাঁটা আয়না, খাটো টেবিল। ঘরটা পেরিয়ে বাইরে ঘেঁষে উড়ে যাচ্ছে। সোনালি মেঘে ঝলমল করছে আকাশটা। লম্বা লম্বা তাল নারকেল গাছের ঝাড়। নারকেল পাতায় পাতায় হাওয়ায় মৃদু দে দোল দোল। পাতায় পাতায় বুলবুলি কোনটা এদিক ফিরে কোনটা ওদিকে ফিরে বসে সেই মৃদু মৃদু দোল খাচ্ছে।

শুভম হঠাৎ কোথায় বেরিয়ে গেল, নীপাকে ফ্ল্যাটে একা রেখে। এইতো মুশকিল। নীপাকে কিছু না জানিয়েই কী যে করে, বোঝামুশকিল। অবশ্য এরই মধ্যে অনেক কিছু করে ফেলেছে নীপা। কোথায় পেয়েছে একটা ফুলঝাড়ু। তাই দিয়ে শোবার ঘরটার মেঝে সাফ করেছে। বিছানার উপর বেডকভার পেতে দিয়েছে। হাওয়া বালিশজোড়া ফুঁ দিয়ে ফুলিয়েছে। ব্যাগ খুলে টুকিটাকি সাজিয়েছে টেবিলে। কিচেনে একটা স্টোভ পর্যন্ত নেই। থাকলেও কি স্টোভ জ্বালানো যেত? কেরোসিন তেল কোথায়? এই জন্যেই হোটেল অনেক ভালো। ঠিক সময়ে চাটুকু পাওয়া যেত। এইভাবে চায়ের কথা যখন ভাবছিল নীপা তখনই ঢুকল শুভম। ওর পেছনে একটা দশ - বারোবছর বয়সের গ্ন শীর্ণ শীর্ণ চেহারা ছেলে। হাতে রঙচটা ট্রে। তাতে দুকাপ ধূমায়িত চা, দুটো ডিশে চিনি ছড়ানো মাখন টোস্ট সেনটার টেবিলে নামিয়ে রেখে চলে যাচ্ছিল...।

'এ্যাই শোন, তোর নাম কী রে?'

'আশু' --

'রাত নটায় ভাত দিবি। দিবি তো?'

শুভমের দিকে তাকিয়ে শুনল কথাটা আশু। তারপর যাবার জন্য পা বাড়াতেই 'শুধু ভাত দিবি না কি রে ...' কথাটা শুনে থমকে দাঁড়াল। শুনল, 'ডাল, ভাজি, তরকারি, মাছ ... ঠিক নটা থেকে সাড়ে নটার মধ্যে।'

সারা রাত বাইরে জ্যোৎস্না ছিল। নির্জনে শুধু কুকুরের ঘেউ ঘেউ। অনেক দূরে অন্য কোনও এক অচেনা জন্তুর চিৎকার। আধো আধো ঘুম বা তন্দ্রা কেটে যায় নীপার সেই চিৎকারে। বুকটা ঢকাস ঢকাস করে ওঠে। পুবদিকের কোন এক দূরের বাগান থেকে একটাপাখি ডেকে যাচ্ছে সারারাত ধরে। পাখিটার আওয়াজ কখনও যেন শোনা যাচ্ছিল 'বউ কথা কও'।

কখনও মনে হচ্ছিল ‘বউ - উক - গেল’…। আবার কখনও যেন মনে হচ্ছিল, ‘পিউ কাঁহারে, পিউ কাঁহারে…’।

ভোররাতে বাতাসে ঝুরঝুর করা গাছ নীপাকে যেন ডাকছে। এরই জন্য তো বেড়াতে আসা। পাশে শুভম অঘোর ঘুমে অন্ধ হয়ে আছে। ওর স্পর্শের মধ্যে যেন কোন স্পর্শ নেই। অথচ নতুন জায়গায় নীপার ঘুম আসতে চায় না। চোখ বুজে যতই পড়ে থাকা যাক না কেন। কাকের হাঁকডাক শু হলে আর পড়ে থাকা যায় না। কাকভোরেই উঠে চলে আসে নীপা সেই ছোট্ট ঝুলবারান্দায়।

অবশ্য রোজ কাকভোরেই ওঠার অভ্যেস ছিল নীপার। নর্থ ক্যালকাটার হিদারাম ব্যানার্জির গলির তস্য গলির ভেতরে একহাত চওড়া আকাশের তলায় কাক ছাড়া কোন পাখি নেই। কাকভোরে দাদাও ওঠে পড়ে। সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে খবরের কাগজ বিলি করতে। জ্যাঠাইমাও উঠে পড়ে, তোলা উনুন সাফ করে। তারপর গুল ঘুঁটে দিয়ে ধরাবে। নীপা পড়তে বসে। পল সায়েনসে অনার্সের পরীক্ষাটা আর মোটে পাঁচ মাস বাকি তখন দেখতে এসেছিল দিদি জামাই বাবুকে নিয়ে শুভম। দেখতে দেখতে প্র্ন করতে করতে হঠাৎ ওর দিদি বলল, ‘নীপা, শুভম তোমার সঙ্গে একলা কথা বলতে চায়, তোমারও যদি কিছু বলার থাকে বলতে পার।’

শুভম ছাড়া ঘর থেকে উঠে সবাই পাশের ঘরে চলে গেল। শুভম তো প্রথমে চুপ করেই রইল, কিছু বলছিল না মুখ ফুটে। নীপাও চুপ করে বসেছিল। মশা কামড়াচ্ছিল দুজনকেই। তখন নীপাই প্রথম কথা বলছিল, ‘আপনাকে মশা কামড়াচ্ছে…’

‘আমাকে কি বিয়ে করতে ইচ্ছুক আছেন?’

নীপা এমন ধারার প্র্ন থমকে উঠেছিল। উত্তর দেয়নি।

‘আপনার কী ভাল লাগে বলুন তো। আমার কিন্তু বেড়াতে ভাল লাগে।’

‘আমারও’, এবার ঘাড় কাত করে উত্তর দিয়েছিল নীপা। সেই বেড়ানো হচ্ছে বিয়ের পর। আর পরীক্ষা হল না। ঠেলে বিয়ে দিয়ে দিল বাবা অভাবের সংসার টানার একটা পন্থা হিসেবে।

আটটায় ঘুম ভাঙল শুভমের। হুড়মুড় করে উঠে বসল, বলল, ‘এই ডাকোনি কেন?’ দৌড়ে টয়লেটে ঢুকল। মিনিট দশেক পর বেরিয়ে এল। ইতিমধ্যে আশু এসে গেছে ট্রে হাতে। তাতে চা, ওমলেট, মাখন টোস্ট। একে একে নামিয়ে রাখছে টেবিলে। শুভম বাইরে বেরোবার শার্ট প্যান্ট পরতে লাগল ততক্ষণে।

‘কোথায় যাবে?’

‘সাইটে। দেখে আসি রাজুদার মালপত্র কনসাইনড হয়ে এসেছে কিনা। সঙ্গে কে কে এসেছে সকাল ছটায় তো ট্রাক পৌঁছে যাবারকথা।’

‘বাবারে বাবা, সক্কালবেলাতে কাজের পেছনে ছোটা শু হল …।’

বারে তোমাকে তো বলেছি, মাত্র ছ’ঘন্টার মামলা, আজ বিকেলের মধ্যে কাজটা শেষ হয়ে যাবে।’ শুভম দাঁড়িয়েই ওমলেট টোস্টপ্রায় গিলতে লাগল।

‘তুমি কাল বলেছ চার ঘন্টার মামলা।’

‘তাই?’ মুখ ভরতি করে চিবোতে লাগল। শেষটুকু গিলে ফেলে চায়ের কাপ তুলে নিল, বলল, ‘মিনিমাম চার ঘন্টা, ম্যাক্সিমাম ছয় ঘন্টা, মানে কাজটা চার ঘন্টারই কিন্তু ওয়ার্কারদের আইড্‌ল্ টাইম দু ঘন্টা।’

‘তুমি কাল বলেছ রাতের ঘুমোবার আগে আজ সকালে একটা ঐতিহাসিক পোড়ো মন্দির দেখাতে নিয়ে যাবে, মন্দিরের দেওয়ালে টেরাকোটার শিল্প …’

‘ও হ্যাঁ হ্যাঁ’, চায়ের কাপ থেকে চা প্রায় ঢকঢক করে গিলে বলল, ‘‘ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গেল যে। সকাল ছটায় ডাকলে না কেন।’ জুতে পরতে পরতে বলল, ‘কাল যাব, কাল সকালে … কথা দিচ্ছি…’ । তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে গেল।

চাটা দিয়েই আশু বেরিয়ে গেছিল। আবার এল ডিশ ফিস নিতে। একটা একটা করে ট্রেতে তুলছিল। কী রোগা ছেলেটা। উসকো খুসকো চুল। ছেঁড়া গেনজি, ময়লা হাফপ্যান্ট, হাঁটুধূসর খালি পা।

‘তোর নাম, ভালো নাম আশুতোষ। তাই না রে?

মাথা তুলল না। উত্তর এল, 'হ্যাঁ।

'কোথায় থাকিস?'

উত্তর এল একই ভাবে, 'দোকানে' --

'সেটা কোথায়?'

'হোটেলের উলটোদিকে'।

'ঝুপড়ির দোকান?'

'হ্যাঁ', বলে মুখ তোলে, তাকায় নীপার দিকে। মুখে হাসি নেই। চোখে সন্দেহ।

'ঐ ঝুপড়ির দোকানে সব সময় থাকিস। মানে দোকানেই ঘুমোস, দোকানেই খাস?'

মাথা নামাল আশু। বলল, 'হ্যাঁ'।

'তোর মা বাবাও ঐ ঝুপড়ির দোকানে?'

'না দেশে!'

'দেশ কোথায়?'

'সেটা কোথায়?' এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আশু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

'তোরা ক'ভাই?'

'তিন ভাই চার বোন।'

'তুই ছোট?'

'না বড়।' ট্রে হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় যেন প্রশ্নের হাত থেকে ওর নিষ্কৃতি দরকার। নীপা ছাড়ে না। বলে, 'তুই দেশে যাস না?'

'না, তিন বছর যাইনি।' উত্তর দিয়েই বড় বড় চোখে তাকাল ছেলেটা। কিন্তু চোখ দুটো বড় ঠাণ্ডা। নীপা ওর দিকে স্থির তাকিয়ে থাকে, প্রশ্ন করে, 'কেন?' ছেলেটা ফের মুখ নামায়। যেন কিছু বলতে চায়, যেন সে বলতে যা চায় যেন তা বলা ঠিক নয়। হঠাৎ মাথা তুলে বলে ফেলল, 'বাবা বলেছে মঙ্গলজেঠুর পাওনা টাকা যতদিন না শোধ হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত বাড়ি আসবি না। বাড়ির ভাত পাবি না'।

শুভমের ফিরতে ফিরতে দুপুর অনেকখানি গড়িয়ে গেল। আশু দুপুরের ভাত কখন রেখে গেছে। ঠাণ্ডা বরফ হয়ে গেছে। শুভমের মুখখানা কালো দেখাচ্ছে। ওটা কি রোদে পোড়া কালো, না কি নতুন কোনো সঙ্কট।

'কে জানত এমন ঝামেলা হবে?' লাল চেয়ার টেনে বসে জুতো খুলতে খুলতে যখন বলল কথাটা শুভম তখন তাকে খুবই ক্লান্ত আর বিমর্ষ দেখাল। ট্রাক ভরতি মেশিনারি ইক্যুইপমেন্ট, উডেন ট্রাকচার, ইলেকট্রনিক অ্যাপলায়েনসেস সব পাঠিয়ে দিয়েছে রাজুদা। তার সঙ্গে এসেছে টেকনিশিয়ান কুশল সেন, গজানন মিস্ত্রি, বাপি আর আশরফ। শেষ দুজন লেবার। ট্রাকটা মালপত্র নিয়ে কেশরিলালের ফ্যাক্টরির মেন গেটের সামনে এখনও দাঁড়িয়ে আছে। গেট খোলা হচ্ছে না। রাজুদার মালপত্র ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। কেশরিলালের ফ্যাক্টরির কোনও কর্মী বা ক্যাজুয়াল কর্মী বা লোকাল লেবারকে হাত লাগাতে দিচ্ছে না কর্মী ইউনিয়ন। কারণ ঐ মেসিন আর ইলেকট্রনিক্স অ্যাপলায়েনস প্ল্যানটে বসানো হলে চোদ্দোজন ক্যাজুয়াল কর্মীর কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। উপরন্তু ফ্যাক্টরির নিয়মিত কর্মীদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের ছাঁটাই হয়ে যাবে।

ক্যাজুয়াল কর্মীদের কাজ থাকবে না এবং কিছু নিয়মিত কর্মীর চাকরি থাকবে না শুনে শুভমের মনটা কেমন করে উঠল। শুভমের বাবার চাকরি চলে গেছিল। কত কষ্ট করে আধপেটা খেয়ে বা কিছুই না খেয়ে শুভমকে পড়িয়েছে। চাকরি না থাকলে বা কাজ না জুটলে একটা ফ্যামিলির যে কী দুরবস্থা হয় তা নীপাও জানে। নীপাকে তো আর পড়াতে পারলেন না বাবা। শেষে দাদা খরচ চালাল। কিন্তু পরীক্ষাটা দেওয়া হল না। এমন পাত্র হাতছাড়া হয়ে গেলে নিষ্কপর্দক পিতা তাঁর কন্যার আর বিয়ে দিতে পারবেন না। গরীবের মেয়ে পরীক্ষার সুযোগ অনেক পাবে, কিন্তু বিয়ের সুযোগ আর পাবে না।

মেশিন ইক্যুইপমেন্ট প্ল্যান্টে ঠিকঠাক ইনস্টল না করা পর্যন্ত কেশরিলাল কোনও চালানেই সই দেবেন না। রাজুদার সঙ্গে

ঐ রকমই কনট্র্যাক্ট কেশরিলালের। কিন্তু সেসব মেশিন ফ্যাক্টরিতে ঢুকিয়ে প্ল্যানটে বসিয়ে দেবার দায়িত্ব নিতে হয়েছে শুভমকে রাজুদার প্রতিনিধি হিসেবে। অথচ একাজের জন্য চোদ্দো জনের ভাত মারা যাবে, কয়েক জনের চাকরি যাবে। আর সে সব হবে কিনা প্রত্যক্ষভাবে শুভমের হাত দিয়ে।

কেশরিলালজীর টেকনোলজিস্ট পি. এ. ইঞ্জিনিয়ার বসুচৌধুরী, ‘কিন্তু সব ভালোরও কোনও সময় কোনও একটা পয়েনটে শেষ হতে বাধ্য। যদি কাজের এফিসিয়েনসি বাড়াতে হয় -- এই সব ইক্যুইপমেন্টতে খরচা করে কেশরিজী বসাচ্ছেন কী জন্য, আউটপুট ইম্প্রুভ করার জন্য।’

‘আপনি কর্মীদের পক্ষে কথা বলে কেশরিজীর কাজে নাক গলাতে পারেন কি,’ বলল ফ্যাক্টরির সুপারভাইজার গণেশ মহাপাত্র, একটা অল্প বয়সী ছোকরা, ‘বলতে পারেন মেন গেট খোলার দায়িত্বটা কেশরিজীর। সেটা খোলার ব্যবস্থা হচ্ছে ---’

‘তাড়াতাড়ি খুলুন, বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে।’

‘দেরি একটু হবে দাদা, দেখছেন তো কামবন্ধ মুভমেন্ট হচ্ছে কর্মীদের।’

‘দেখতেও বলছেন, আবার বলছেন নাক গলাবেন না ---’ বলেছিল শুভম। ‘এটা কী কোন সমাধান? আপনারা কি চান মাল ফেরত যাক?’ এরকম অনেক চাপানউতোর চালিয়ে শুভম ক্লান্ত হয়ে ফিরেছে।

এক গেলাস খাবার জল এগিয়ে দিয়ে নীপা বলল, ‘বেশ হয়েছে, রাজুদার মাল কেশরিজীর ফ্যাক্টরি মেন গেটের সামনে পড়ে থাক, কর্মী ইউনিয়নের কামবন্ধ আন্দোলনও চলতে থাকুক। আমরা বেড়াতে চলে চাই...।’

‘তা হয় না’, বলতে বলতে খেতে বসল শুভম।

‘কেন হয় না?’ খেতে দিতে দিতে বলল নীপা।

‘রাজুদা যেমনটি চাইবে তেমনটি করতে হবে।’ বলল শুভম খেতে খেতে।

‘তোমার রাজুদা যেমনটি চাইবেন তোমাকে তেমনটিই করতে হবে? রাজুদা যদি চান কেশরিজী কর্মী ছাঁটাই ফাঁটাই যা খুশি ককগে, তোমার সেসব দেখার দরকার নেই, ওরা যেমন করে পারে গেট খুলুক, তুমি যন্ত্র বসিয়ে দিয়ে ...।’

‘না না না, নীপা ভুল করছ, রাজুদা ওরকম ভাবতেই পারে না।’

খেয়েদেয়ে আবার ছুটল শুভম। পড়ে রইল ঐতিহাসিক পোড়ো মন্দিরের দেয়ালের টেরাকোটা শিল্পনির্দশন। কাল সকালেও সে সব দেখার কোনও আশা নেই। আশু ঢুকল। থাকা বাটি গেলাস নিয়ে যেতে এসেছে। মন খারাপ করে অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিল নীপা। আশুকে দেখে নীপা যেন একটা অবলম্বন পেল, ‘কী রে আশু তোর খাওয়া দাওয়া হয়েছে?’ --- উত্তর এল, ‘না’।

‘সে কী রে, এখনও খাসনি? কখন খাস?’

‘দুটো বাজলে ---’

‘কেন, দুটো বাজলে কেন?’

‘তখন মঙ্গলজেঠু বাড়ি যান।’

‘তোর মঙ্গলজেঠুর বাড়ি কোথায়?’

‘বাজারের কাছে স্টেশনের রাস্তায় ---’

‘মঙ্গলজেঠুর বাড়ি তুই গেছিস কখনও?’

‘হ্যাঁ।’

‘কেমন বাড়ি?’

‘খুব ভালো। দোতলা পাকাবাড়ি, নীচতলায় ভাড়া।’

‘নিজের বাড়ি থাকতে এখানে ঝুপড়ির দোকান কেন রেখেছে?’

‘বাড়িতে নীচতলায় গমকলের দোকান। এখানে ফুটপাতে ঝুপড়ির খাবারের দোকান। এই দোকানে মঙ্গলজেঠুর লক্ষীপুজো গনেশপুজো, সব ঠাকুরের পুজো হয়। বিশ বছরের পুরোনো দোকান। জেঠ্যু ট্যাঁকে দু’টাকা নিয়ে দোকান খুলেছিল ---’

‘তুই কত মাইনে পাস?’

‘দশ টাকা’

‘অ্যাঁ’, চমকে ওঠে নীপা। ভু কুঁচকে তাকায়। ‘মোটে দশ, ঠিক বলছিস? ভুল বকছিস।’

‘দশ টাকাই দয়।’

‘সে কী রে, এত কম?’

‘আমি’, বলেই জিব ঝুলিয়ে ঠোঁট ভেজায় আশু, ‘আমি যে বিনে পয়সায় দুবেলা ভাত খাই, দুবেলা টিফিন খাই। পুজোয় একটা জামা একটা প্যান্ট্ পাই। আর তাছাড়া একশো টাকা করে বাবার দেনা শোধ হচ্ছে।’

‘ও দেনা শোধ। তিন বছর ধরে তোর বাবার দেনা শোধ হচ্ছে। তোর বাবা কত দেনা করেছিল?’

‘জানি না’। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে আশু। ওর চোখের তারায় গাঢ় বেগুনি রঙ। জানলার পর্দার বেগুনি রঙের একবিন্দু ছায়া ওর দৃষ্টিটাকে ঢেকে দেয়।

শুভম যখন ফিরল তখন রাতের উজ্জ্বল চাঁদ তেমন গোলাকৃতি পায়নি। বাঁদিকটায় একটু ক্ষয় পেয়েছে। জ্বলজ্বল করা সন্ধেতারাঅনেক আগেই অসংখ্য নগণ্য তারার মধ্যে হারিয়ে গেছে। গাছের ভেতরে ভেতরে সবুজ রঙের চেয়ে অন্ধকারটাই জমে উঠেছে বেশি,সে রকম জমে উঠেছে শুভমের মুখে। সেই অন্ধকার জমে ওঠা মুখে গভীর দৃষ্টি হেনে নীপা লক্ষ করল দুশ্চিন্তার জটিল রেখা শাখাপ্রশাখায় সারা মুখে বিস্তৃত। দেখে নীপাও স্তব্ধ হল। বিমর্ষ হল। মুখ ফিরিয়ে নিল। ততক্ষণে ঝুপ করে বসে পড়ল একটা চেয়ারে শুভম। মচ করে শব্দ হল।

‘কোন উপায় না দেখে রাজুদাকে ফোন করেছিলাম।’ জুতোর ফিতের গিঁট খুলতে খুলতে, যেন কোনও গিঁটই খুলছে না, এমন একটা বিকৃত মুখ করে বলল, ‘ভাবতে পারিনি রাজুদার মুখ থেকেও এমন উত্তর পাব।’

‘কী বললেন তোমার রাজুদা?’

‘কী বলবেন?’ মাথা নেড়ে আফশোস করার মত হাসল একটা। ‘বললেন কেশরিজীর কোম্পানিতে লেবার মুভমেন্ট যত ন্যায্যই হোক, মুভমেন্টের সাপোর্টে টুঁ শব্দটি করো না। আর বললেন কেশরিজীর মেন গেট খুলিয়ে মেশিন ফেশিন শুদ্ধু ট্রাক ঢুকিয়ে সেগুলো ইনস্টল করার পরিবেশ যতদিন না করতে পারছেন ততদিন যেখানে আছ সেখানেই অপেক্ষা কর।’

‘বাঃ চমৎকার!’ নীপার মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে, ‘বললে না যে তুমি বেড়াতে এসেছ। অপেক্ষা করা সম্ভব নয়।’

‘না সেকথা বলা যাবে না। বেড়াতে এসেছি বললে রাজুদার ফ্ল্যাট ছেড়ে হোটেলে উঠতে হয়। কাজটার কমিশন লুজ করতে হয়।রাজুদার কাজে এসেছি বলেই রাজুদার ফ্ল্যাট ব্যবহার করছি। ...’ বলে একটু থামল শুভম। তারপর উঠে পোশাক বদলাতে বদলাতে বলল, ‘তাছাড়া হোটেলে উঠবার পয়সা আমার নেই।’

চোখ ছলছল করে ওঠে নীপার। পোড়ো মন্দিরের দেয়ালে টেরাকোটার শিল্প দর্শন, পরের দিন চন্দননগরে হুগলির পারে বিচরণ, তারপরের দিন ব্যাণ্ডেল চার্চ পরিভ্রমা, তারও পরের দিন ত্রিবেণীতে হুগলি - কুন্তী - সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থলে গমন নৌকোয় চড়ে, সবই মন থেকে সঙ্গে সঙ্গে মুছে গেল। রাজুদার এই ফ্ল্যাটেই সবকটা দিন বন্দী থাকতে হবে দুজনকে? এবারেও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে নীপা। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কন্ঠস্বর। রাজুদার আদেশ, নির্দেশ মান্য করেই চলতে হবে শুভমকে? কেন? কারণটা কী?...

‘তুমি নিজে স্বাধীনভাবে বিজনেস করতে পারো না?’

‘না। কে দেবে আমাকে কাজ? রাজুদাই দিচ্ছে। তাই রাজাদুই আমাকে টাকা ধার দিয়ে ক্যাপিটাল যোগাচ্ছে। রাজুদার কাছে আমার অনেক ঋণ ...।’

অনেক ঋণ।

‘অনেক ঋণ? কতটা শুনি?’ বলতে গিয়ে নীপা বলতে পারল না। দরজাটা আর বন্ধকরা হয়নি। খাবার নিয়ে ঢুকছে আশু। আশুর দিকে তাকিয়ে থাকে নীপা। চোখ ভরে যায় জলে। আশুও জানে না, আশুর বাবার কতটা ঋণ ওর মালিকের কাছে।

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com